Living the Lotus

Buddhism in Everyday Life

10
2025
VOL. 241

Members in the US, and from Japan, Join the 2025 Nisei Week Grand Parade in Los Angeles, August 10

Photo@EricXiong

Living the Lotus
Vol. 241 (October 2025)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা～দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

‘পাঠ’ নামক ‘শিক্ষা’

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

সাধুসন্ত ও জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব

বছরের এই সময়ে আমরা প্রায়ই শুনি—“শরৎকাল হলো পাঠের ঋতু।” আগের সংখ্যার উপসংহারে আমি উল্লেখ করেছিলাম—“শেখাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার প্রসঙ্গে আবার লিখব।” সত্যিই, সেই শিক্ষার মূল চাবিকাঠি হলো পাঠ। আমি বিশ্বাস করি, বই পড়া কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং আমাদের জীবনের সবচেয়ে সহজলভ্য ও পরিচিত সাধনার একটি।

জাপানের এদো যুগের শেষভাগের এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ইয়োশিদা শোইন, যৌবনে উত্তরণের প্রথাগত অনুষ্ঠান (সেইসময় প্রায় পনেরো বছর বয়সে করা হতো) সম্পন্ন করতে যাওয়া তাঁর এক চাচাতো ভাইকে উপহার হিসেবে দেওয়া “সামুরাইয়ের সাতটি নিয়ম” নামের শিক্ষামূলক উপদেশে তিনি লিখেছিলেন, “মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েও যদি কেউ অতীত ও বর্তমানের সত্য উপলব্ধি করতে না পারে, আর সাধু-সন্ত ও জ্ঞানীগুণীদের কাছে শিক্ষা না নেয়, তবে সে কেবল নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকা এক সংকীর্ণমনা ব্যক্তিতে পরিণত হবে। তাই সৎ মানুষের কর্তব্য হলো পাঠকে সঙ্গী করে, পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানী ও ঋষিদের বন্ধু করে তোলা।” এইভাবে শোইন দেখিয়েছিলেন যে, শেখাকে গভীরতর করার এক অপরিহার্য উপায় হলো পাঠ।

প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন—“পাঠই হলো মানুষের জন্য সেই শ্রেষ্ঠ উপায়, যার মাধ্যমে অন্যের দুঃখকষ্টে অর্জিত জ্ঞান সহজেই আত্মস্থ করে, নিজেকে বিকশিত করা যায়।” অতএব, মহান ব্যক্তিদের চিন্তা ও রচনার সংস্পর্শে আসা এক অর্থে প্রকৃত শিক্ষা—যা শেখায় কীভাবে একজন মানুষ হিসেবে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপন করতে হয়। আর এই সত্য যুগে যুগে কখনো পরিবর্তন হওয়ার নয়।

অবশ্যই, পাঠ কেবল সাধু-সন্ত ও জ্ঞানীগুণীদের শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নানা ধরনের বই আমাদের হৃদয়কে আন্দোলিত করে—রোমাঞ্চ, বিস্ময়, মানুষের দুঃখ এবং আনন্দ সবই শিখায়—এবং প্রতিটি বই আত্মার জন্য পুষ্টির কাজ করে। যদিও আজকাল বইয়ের দোকান কমে গেছে, আর ডিজিটাল-নির্ভর লোকেরা হয়তো বলতে পারেন, “এই সময়ে কাগজের বই?” তবু, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, পাঠের রয়েছে বিস্ময়কর সুফল—যা বয়স নির্বিশেষে আমাদের মন এবং শরীর উভয়ের জন্য উপকারী।

কাগজের বই পড়ার উপকারীতা

একটি গবেষণা দেখিয়েছে, মানুষ যখন গল্প পড়ে, তখন সে সেই কল্পিত জগৎকে কল্পনা করে এবং চরিত্রগুলোর অনুভূতিতে নিজেকে যুক্ত করে। এর ফলে ব্যক্তি নিজের স্বভাব ও মনোভাব আরও ভালোভাবে জানতে পারে। পাশাপাশি, অন্যদের অবস্থান ও অনুভূতিকে বোঝার সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতাও বিকশিত হয়, যা অন্যদের প্রতি যত্ন এবং বিবেচনার মতো মূল্যবান আবেগের জন্ম দেয়। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, যারা ছোটবেলায় প্রচুর বই পড়েছে এবং যারা তা করেনি—তাদের মধ্যে শব্দভাণ্ডারের ক্ষমতায় প্রায় তিনগুণ পার্থক্য রয়েছে।

"সাত বছরের একটি শিশু কতটা পড়াশোনা করে, তা বিশ বছরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের মূল্য নির্ধারণ করবে।"এটি প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের একটি উক্তি বলে মনে করা হয়। এর অর্থ হলো, যেসব দেশে পাঠের মাধ্যমে মানসিক ও বুদ্ধিবিকাশকে সমানভাবে বিকশিত করা হয়েছে, সেখানে মানুষ হয় শিক্ষিত, ভদ্র ও বন্ধুত্বপূর্ণ। আর এমন মানুষদের সমৃদ্ধ উপস্থিতিই সেই জাতিকে শক্তিশালী করে তোলে।

স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিভাইস থেকে আমরা যা পাই, তা কেবল "তথ্য"। তবে গণিতবিদ মাসাহিকো ফুজিওয়ারা বলেছেন—"মানুষ কেবল বই পড়ার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন তথ্যকে সংযুক্ত করে জ্ঞানে পরিণত করতে পারে। সেই জ্ঞান অভিজ্ঞতা, মনন এবং আবেগের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়।" (উৎস: 『বুকস্টোর রক্ষা করুন』, পিএইচপি ইনস্টিটিউট) অর্থাৎ, তথ্যকে সঠিকভাবে বিচার করার জন্য সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ মানসিক শক্তি প্রয়োজন। এবং সেই মানসিক ও আবেগগত ভিত্তি—যা আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করে—সেগুলোই পাঠের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

কাগজের বই পড়ার আরও অনেক সুবিধা রয়েছে—যেমন শিথিলতা, মানসিক চাপ কমানো এবং স্মৃতিশক্তি উন্নত করা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমরা বই (ধর্মগ্রন্থ) পড়ে শাক্যমুনি বুদ্ধ ও কনফুসিয়াস উভয়ের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারি। আমরা যত বেশি জীবনী পড়ব, তত বেশি অন্যান্য মানুষের জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার আনন্দ অনুভব করব। এছাড়া, পরবর্তী প্রজন্মের শিশুদের জন্য কাগজের বইয়ের সঙ্গে পরিচয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বইয়ের স্পর্শ, বাবা-মায়ের উচ্চস্বরে পড়ার কণ্ঠস্বর এবং তাদের কথার ছোঁয়া শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশকে সমৃদ্ধ করে এবং মানবিক জ্ঞান ও আবেগের ভিত্তি গড়ে তোলে।

আমি নিজেও বই পড়া উপভোগ করি, মানুষ হিসেবে জীবন যাপনের ধারা শিখতে এবং হৃদয়কে সমৃদ্ধ করতে। তবে, যখন আমার সন্তানরা ছোট ছিল, তখন রাতে তাদের ছবি-কাহিনী বই পড়ে শোনাতে গিয়ে প্রায়শই আমি নিজেই অজান্তে ঘুমিয়ে যেতাম। তবু, আমি মনে করি এই মুহূর্তগুলো হলো মূল্যবান "পঠনের স্মৃতি", যা বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে আবেগ ও সংযোগ গড়ে তোলে। সত্যি বলতে, নিজেকে গঠন করার জন্য এবং অন্যকে লালন-পালনের দৃষ্টিকোণ থেকে, দীর্ঘ শরৎকালীন রাতের আনন্দকে আরও সমৃদ্ধ করতে "পাঠ" নামক শিক্ষণীয় অভ্যাসকে যোগ করবেন না কেন? এবং এটিকে আপনার দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তুলবেন না কেন?

'কোসেই' অক্টোবর ২০২৫ইং।

নিজে বদল হলে, পৃথিবী বদলে যাবে

সো বুনতি, রিস্‌সো কোসেই-কাই পুনমপেন, কম্বোডিয়া।

এই অভিজ্ঞতার আলোকে বক্তব্যটি ২৪ মে, ২০২৫ইং অনলাইনে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়া যুব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছিল।

আমি ১৯৯১ সালে কম্বোডিয়ার সোল পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমাদের পরিবারে পাঁচজন সদস্য ছিল—আমার বাবা-মা, বড় ভাই, বড় বোন এবং আমি। আমাদের একটি ফলের দোকান ছিল। প্রতিদিন ভোরে উঠে বাবা-মা এবং বড় বোন দোকান খোলার জন্য পরিশ্রম করতেন, আর আমাদের ঘর-বাড়ি ও জীবন যাত্রা ছিল ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে, আমার বড় ভাই কম্বোডিয়ার রাজধানী পুনমপেনে একটি জাপানি কোম্পানিতে কর্মরত আছেন এবং রিস্‌সো কোসেই-কাই পুনমপেন শাখা'র কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করছেন। আমার পরিবারের মধ্যে প্রথমে কোসেই-কাইতে যোগদান করেছিলেন আমার বড় ভাই। তিনি ২০০৭ সালে যোগদান করে দুই বছর গাকুরিনে পুণ্ডরীক সূত্র অধ্যয়ন করেন এবং এরপর কম্বোডিয়ায় ফিরে আসেন। ভাইয়ের দেশে প্রত্যাবর্তনের পর, ২০১২ সালে আমি কোসেই-কাইতে যোগদান করি। আমার ভাই এবং রেভারেন্ড মাসাতোশি শিমামুরা (বর্তমানে উওয়াজিমা চার্চের প্রধান) যে উদাহরণ দেখিয়েছেন—অন্যকে আগে সুযোগ দেওয়ার আদর্শ—তা আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এছাড়া, কোসেই পত্রিকায় ছাপানো প্রতিষ্ঠাতার সেই উজ্জ্বল হাসির ছবিও আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, যা যোগদানের আরও একটি কারণ ছিল। যোগদানের পর, আমি ভাইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করি।

২০১৫ সালে, আমি নিজেও গাকুরিন কোর্সে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই। সেখানে আমি শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্মানিত প্রেসিডেন্টের শিক্ষা গ্রহণ করি এবং শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের মনকে পরিমার্জিত করি। ২০১৭ সালে গাকুরিন থেকে স্নাতক হই, এবং কম্বোডিয়ায় ফিরে এসে কর্মজীবী হিসেবে কাজ শুরু করি।

২০১৯ সালে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। শুরুতে, আমাদের সম্পর্ক ভালো ছিল, এবং আমার স্ত্রীও চাকরিতে ছিলেন, তাই দৈনন্দিন জীবনে বড় কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু ২০২০ সালের দিকে, কোভিড-১৯ মহামারী ধীরে ধীরে আমাদের জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে শুরু করল। সরকার বাইরে বের হওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করল, আর আমার ও স্ত্রীর বেতন অর্ধেক করা হলো, ফলে আগের জীবনযাত্রা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ল।

সেই সময় আমি আমার অর্ধেক বেতন সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর হাতে তুলে দিতাম, যার কারণে নিজের ইচ্ছামতো কিছু কেনাও সম্ভব ছিল না। যদিও আমার স্ত্রীও কাজ করতেন, তবুও আমি জানতাম না যে তিনি বেতন কিভাবে ব্যবহার করছেন। এতে আমার মন অস্থির হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে আমি ভাবতে শুরু করলাম—"হয়তো তিনি অযথা খরচ করছেন, হয়তো একা নিজের জন্য বিলাসিতা করছেন।" এই অবিশ্বাস ধীরে ধীরে রাগে পরিণত হলো, আর আমাদের মধ্যে প্রতিদিনই ঝগড়া বাধতে লাগল। কোভিড-১৯-এর কারণে বাইরে বেরোতে পারছিলাম না, তাই আমার কথা বলার বা মন শান্ত করার জন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমরা কেবল একে অপরের উপর রাগ প্রকাশ করতে করতে দিন কাটাচ্ছিলাম।
আমার দিনগুলো এমনই কাটছিল, কিন্তু একদিন আমি ঠিক করলাম—শান্তভাবে আমার স্ত্রীর কথা শোনা যাক। টাকা সংক্রান্ত আমার অবিশ্বাস নিয়ে আমি সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন সে আমাকে তার ব্যাংক বই দেখালো। তাতেই আমি বুঝতে পারলাম, যে সে আমার দেওয়া সমস্ত অর্থ

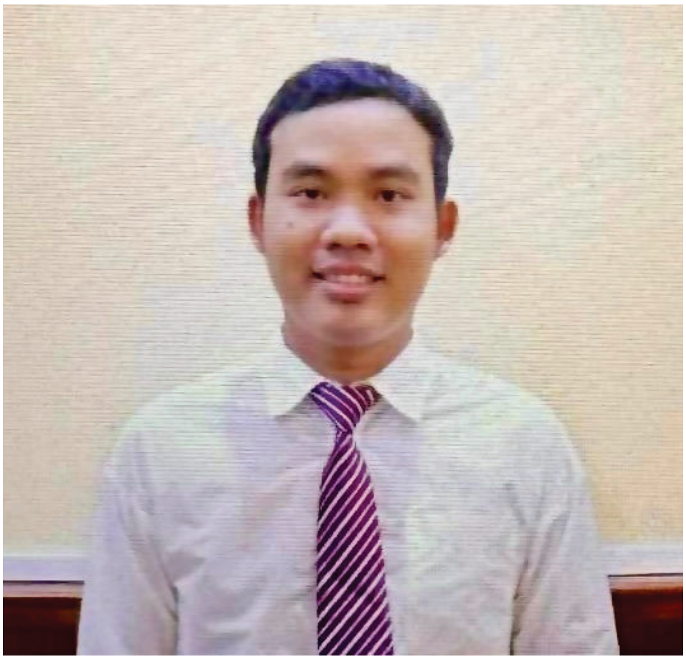

মি. সো বুনতি

সংরক্ষণ করছিল।

সে বলল, "আসলে, আমি আমার বেতন দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খরচ চালাই, আর তুমি যা দিয়েছ তা পরিবারের জন্য সঞ্চয় করি।" এই কথাগুলো শুনে আমি বুঝতে পারলাম, আমি কতটা অহংকারী ছিলাম, ভাবতাম একমাত্র আমি পরিবারের ভরণপোষণ করি। নিজের এই ভুলের জন্য আমি লজ্জিত হলাম এবং তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। শান্তভাবে তার সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম, সে আসলে কী ভাবছিল, এবং সেই বুঝবার ফলে তার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল। এরপর আমাদের সম্পর্ক উন্নতি পেয়েছে, এবং আমরা আবার শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে ফিরতে সক্ষম হয়েছি।

এখন ফিরে দেখলে মনে হয়, যদি শুরু থেকেই আমি শান্তভাবে তার সঙ্গে কথা বলতাম, তবে হয়তো এতটা অবিশ্বাস ও অস্বস্তি বোধ করতাম না, এবং হৃদয়ে এত নেতিবাচক অনুভূতি জমা হত না।

এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি শিখেছি, কোনো বিষয়ের কেবলমাত্র পৃষ্ঠের দিক দেখে সিদ্ধান্ত না নেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ। শান্তভাবে এবং মনোযোগ দিয়ে অন্যের কথা শোনা আমাদের জন্য অপরিহার্য। অন্যের কথা শোনার মাধ্যমে আমরা তাদের চিন্তা ও পরিস্থিতি বোঝার সুযোগ পাই, এবং এভাবেই আমাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে—এটি আমি নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছি।

আমারও এক অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। কম্বোডিয়ায় সাধারণত বিবাহের পরপরই দম্পতির সন্তান হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমার স্ত্রী এবং আমার ক্ষেত্রে, বিয়ের তিন বছর পেরিয়েও সন্তান হয়নি। বন্ধু -বান্ধব এবং আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা হলে প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা হতো, "এখনো কি সন্তান হচ্ছে না?" আমরা কেন সন্তান নিতে পাচ্ছি না তা জানতাম না, আর সেই অনিশ্চয়তার কারণে আমরা অপরাধবোধ এবং গভীর হতাশায় ভুগছিলাম।

একদিন, আমরা যখন আমার বাবা-মায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম, তখন আমার স্ত্রীকে একজন আত্মীয় মহিলা বলেছিলেন, "তোমার এখনও সন্তান হয়নি কেন? দ্রুত সন্তান নাও।" এই কথাগুলো শুনে আমার স্ত্রী মনে করেছিলেন যেন তাকে দোষারোপ করা হচ্ছে, এবং তা তাকে গভীরভাবে আহত করেছিল।

আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে বসে ভাবছিলাম, কেন আমাদের আত্মীয়ীকে এমন কথা বলতে হচ্ছে। একসঙ্গে আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কথার বাইরের অর্থ বা অন্তর্নিহিত অনুভূতিটিকে গভীরভাবে দেখার। তখনই বোঝা গেল, সেই শক্তিশালী কথার পিছনে প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা— "আমাদের দ্রুত সন্তান হোক এবং আমরা সুখী হই।"

আমরা এটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম কারণ, পূর্বেও আমাদের জীবনে এর মতো অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। এটি ঘটেছিল যখন আমি জাপানে গাকুরিন কোর্সের ছাত্র ছিলাম। বিদেশী প্রশিক্ষণ কোর্সের সময় আমি একটি প্রশিক্ষণ ভ্রমণের হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে ছিলাম। তখন অবশিষ্ট ব্যালেন্সে একটি অসঙ্গতি ধরা পড়ল। এর ফলে, প্রশিক্ষক আমাকে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন। এটি ছিল অত্যন্ত কষ্টকর অভিজ্ঞতা, এবং আমি গভীরভাবে বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলাম।

এরপর, আরেকজন প্রশিক্ষক আমার কাছে এসে সহানুভূতির সঙ্গে আমার কথা শুনলেন এবং বললেন, "তুমি কি মনে করো, প্রশিক্ষক যখন তোমাকে তিরস্কার করছিলেন, তখন তার মনোভাব কী ছিল? সম্ভবত তিনি চেয়েছিলেন, তুমি যেন আরও উন্নতি করো। তাই নয় কি? কথার পৃষ্ঠের পেছনের মনোভাবটি বোঝার চেষ্টা করো।"

পিছনে ফিরে দেখলে, প্রশিক্ষক-এর মুখ তিরস্কারের সময় একেবারে গম্ভীর ছিল। আমি তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারলাম, তিনি আমাকে ঘৃণা বা অপছন্দের কারণে তিরস্কার করছেন না। এরপর আমি উপলব্ধি করলাম, চার ঘণ্টার দীর্ঘ সময় তিনি আমার জন্যই তিরস্কারের জন্য ব্যয় করেছেন। সেই মুহূর্তে আমি প্রশিক্ষক-এর উদ্বেগ ও করুণাময় হৃদয় অনুভব করতে পারলাম। তখন আমার চোখে প্রশিক্ষক আর কেবল কঠোর ব্যক্তি ছিলেন না—তিনি উষ্ণ ও যত্নশীল মানুষ হিসেবে প্রতীয়মান হলেন।

গাকুরিনের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে, আমি এবং

২০২৪ সালে, মেয়ের প্রথম জন্মদিনে, বুনতি এবং তার স্ত্রী

আমার স্ত্রী চেষ্টার মাধ্যমে শিখেছিলাম—"শব্দের পৃষ্ঠের বাইরে তাকিয়ে, কথার অন্তর্নিহিত অর্থকে বোঝা।" এই চর্চার ফলে আমাদের আত্মীয়দের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয় এবং সম্পর্কের উন্নতি হয়। পাশাপাশি, স্ত্রীর সঙ্গে আমার মধ্যে থাকা দ্বন্দ্ব এবং অপরাধবোধও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, এবং পরিশেষে আমরা একটি সন্তানের আশীর্বাদ লাভ করি।

এরপর, আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই। কম্বোডিয়ায় ফেরার পর, আমি সাত বছর ধরে একটি জাপানি কোম্পানিতে কাজ করছি। আমার বিভাগের সুপারভাইজার জাপানি এবং আমার প্রায় ৩৫ জন অধস্তন কর্মী রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আমি কাজ করছিলাম, কিভাবে সুপারভাইজার এবং অধস্তনদের মধ্যে সম্পর্ক সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করা যায়।

যখন আমি সুপারভাইজারের নির্দেশাবলী কোম্পানির অধস্তনদের কাছে পৌঁছে দিতাম, তারা প্রতিক্রিয়া দেখাতেন, "এটি সম্ভব নয়।" অন্যদিকে,

২০১৭ সালের মার্চ মাসে, গাকুরিন স্নাতক অনুষ্ঠানের পর, মি. বুনতি তার গাকুরিন প্রশিক্ষক এবং সহপাঠীদের সাথে তার সার্টিফিকেট ধরে আছেন (বাম থেকে দ্বিতীয়)

কম্বোডিয়া ওয়ান মিল প্রকল্পে (জুন ২০২৪, বান্টি বাম থেকে দ্বিতীয় স্থানে) পুনমপেনের অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে একসাথে কাজ করছেন।

অধস্তনদের মতামত সুপারভাইজারের কাছে জানালে, আমি কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতাম। সুপারভাইজার ও অধস্তনদের অনুভূতি উভয়কেই উপেক্ষা করতে না পারায়, আমি তাদের মধ্যে চাপে পড়ে যেতাম। ঘরে ফিরেও মানসিক শান্তি হারাতাম এবং কাজের চাপ আমার মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করত।

একদিন, আমি একটি হোজায় এই সমস্যাগুলি শেয়ার করলে, হোজা প্রধান শিমামুরা মহোদয় আমাকে পরামর্শ দিলেন: "ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তনদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা সত্যিই একটি কঠিন ভূমিকা। চেষ্টা করো নিজেকে এমন একটি পাত্র হিসেবে কল্পনা করতে, যা প্রতিটি ব্যক্তির অনুভূতিকে গ্রহণ করে এবং নিজের ক্ষমতাকে বিস্তৃত করে।"

আমি তাঁর এই নির্দেশনা অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশাবলী এবং অধস্তনদের মতামত—উভয়কেই এক বৃহৎ পাত্রের মতো গ্রহণ করার চেষ্টা করলাম এবং তা নিয়মিত প্রয়োগ করতে লাগলাম।

আগে, যখন আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ গ্রহণ করতাম, তখন কেবল তা অধস্তনদের কাছে পৌঁছে দিয়ে বাস্তবায়ন করানো আমার একমাত্র চিন্তা ছিল। অধস্তনরা যদি আমার নির্দেশ অমান্য করত, আমি রেগে যেতাম। আমি না ঊর্ধ্বতনের মনোভাবকে, না অধস্তনদের অনুভূতিকে গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করতাম; শুধু সমস্যা সমাধানের পথ নিয়ে মনোযোগী থাকতাম। যার ফলে, সব ঠিকঠাক না হওয়ায় আমি ক্রমাগত হতাশ এবং বিরক্ত থাকতাম। এই মনোভাবই অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার সহকর্মীদের প্রতি প্রকাশ

পেত এবং কাজের পরিবেশ ও সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলত। তখন আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—সামনে থাকা মানুষকে পরিবর্তন করা এবং তাদের কথায় বাধ্য করা।

তবে, "মানুষের অনুভূতিকে গ্রহণ করার জন্য একটি পাত্র হও" এই উপদেশ পেয়ে ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করলাম। আমি স্থির করি, যেহেতু ভাগ্যক্রমে আমরা একসাথে কাজ করছি, তাই যেকোনো বিষয় প্রথমে গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম—অন্যকে পরিবর্তন করার চেষ্টা নয়, বরং নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টাই সঠিক।

এরপর, আমি ঊর্ধ্বতনের চিন্তা ও ইচ্ছাকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে মনোযোগী হলাম। আর অধস্তনদের ক্ষেত্রে, কেবল নির্দেশ বাস্তবায়ন করানো নয়, তাদের মনোভাব ও মতামত মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করলাম। ফলে, অনেকেই বলতে শুরু করলো—"আমার অনুভূতিটা বোঝা গেছে।" এভাবে ধীরে ধীরে আমার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত হতে লাগল।

এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি শিখেছি যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব সমস্যা সামনে আসে, তা সমাধানের জন্য অপরকে পরিবর্তন করার চেয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করাই শ্রেয়। এভাবে আমরা সত্যিকারের অর্থে অন্যের পরিস্থিতি এবং অবস্থানকে বোঝার সক্ষমতা অর্জন করতে পারি।

প্রতিষ্ঠাতা, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এবং আমার বড় ভাই, যিনি আমার পথপ্রদর্শক হিসেবে ছিলেন—তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। তাঁদের দিকনির্দেশনায় আমি কোসেই-কাই এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং মূল্যবান শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। এই মহান শিক্ষার মাধ্যমে, আমি পারিবারিক জীবন ও কর্মক্ষেত্রে সমস্যাগুলোকে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি।

মহান এই শিক্ষার জন্য, এবং আমাকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য, সমস্ত সুযোগ ও বন্ধনের জন্য আমি অন্তর থেকে কৃতজ্ঞ।

সবাইকে ধন্যবাদ।

২০২৩ সালের নভেম্বরে, পুনমপেন হোজা কম্বোডিয়া ওয়ান মিল প্রকল্পের আওতায় স্কুলে শিক্ষা উপকরণ দান করেছিলেন। সহায়তার জন্য রওনা হওয়ার আগে, দক্ষিণ এশিয়া আন্তর্জাতিক মিশন কেন্দ্রের প্রাক্তন পরিচালক মাসাতোশি শিমামুরা (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়, পিছনের সারিতে) এবং আন্তর্জাতিক মিশন বিভাগের উপ-পরিচালক হিদেমিৎসু সুজুকি (বাম দিক থেকে তৃতীয়, পিছনের সারিতে) বেদিতে প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানান।

Practicing the Dharma in the Here and Now

ষড় ভবচক্র

এই মাস থেকে ইংরেজি অনুবাদ "পুণ্ডরীক সূত্রের সরল ব্যাখ্যা" (২০১৯ সংস্করণ)-এর অনুবাদক ড. ডোমিনিক স্কালাঞ্জেলো এর একটি নতুন ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হচ্ছে। ধারাবাহিকটির শিরোনাম "এখানেই সাধনার ক্ষেত্র" —এর উৎস হলো "পুণ্ডরীক সূত্রের তথাগতের দৈবশক্তি একবিংশ অধ্যায়ে"-এ বর্ণিত "সম্বোধি অর্জনের স্থান"। এই উক্তিটি আমাদের গৃহী বৌদ্ধদের জন্য আলোর দিশারী, যা আমাদের শেখায় যে পরিবার, কর্মক্ষেত্র বা বিদ্যালয়—যেখানেই আমরা আছি, সেখানেই অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবে ধর্মচর্চা করা সম্ভব।

এই ধারাবাহিক রচনার মাধ্যমে, ড. স্কালাঞ্জেলো পুণ্ডরীক সূত্র এবং শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতার উপদেশ থেকে নানা বিষয় বেছে নেবেন এবং দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের শিক্ষাকে কীভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার বাস্তব অনুশীলনের দিকগুলো তুলে ধরবেন।

"যতক্ষণ মন বিভ্রান্তি ও বাসনায় বন্দি, ততক্ষণ আমরা ষড়লোকভূমির পুনর্জন্মের চক্রে আবদ্ধ থাকব, এবং এই জগতের দুঃখ ও কষ্ট কখনোই শেষ হবে না।"

নিক্কিও নিওয়ানো, 'নির্বাচিত উপদেশ।'

আপনারা অনেকেই হয়তো শুনেছেন যে বৌদ্ধধর্মে পুনর্জন্ম বা জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে বিশ্বাস করা হয়। বৌদ্ধ দৃষ্টিতে, সমস্ত জীব এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুবরণ করে, এবং পুনরায় আবার জন্ম নেয়। এভাবেই অনন্তকাল ধরে এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে প্রবাহিত হয়—এটিকেই বলা হয় "সংসারচক্র"। এই ধারণা বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারায় বিরাজমান। বলা হয়—সমস্ত জীব যখন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন তারা ছয় প্রকার অবস্থার বা ছয় ভিন্ন ভিন্ন জগতে জন্মায়। এই ছয় অবস্থাকে বলা হয় "ষড়গতি"। ষড়গতির মধ্যে রয়েছে— নরকলোক: যেখানে রাগ ও ঘৃণায় দগ্ধ হয়ে সীমাহীন দুঃখ ভোগ করতে হয়। প্রেতলোক: যেখানে অশেষ তৃষ্ণা ও অপূর্ণ লালসায় ভোগান্তি চলতে থাকে। তির্যকলোক: যেখানে প্রবৃত্তি ও তাড়নায় অন্ধ হয়ে যুক্তি-বিবেচনা বিসর্জন দেওয়া হয়। অসুরলোক: যেখানে আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

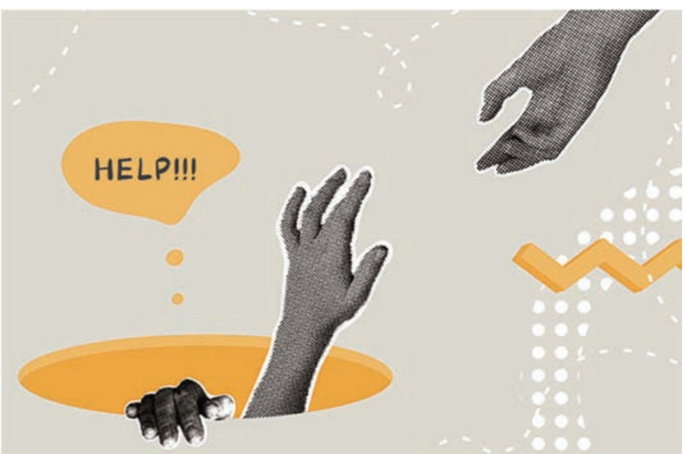

ড. ডোমিনিক স্কালাঞ্জেলো ২০১২ সালে ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানে অধ্যাপনার পর, তিনি ২০১৩ সাল থেকে দুই বছর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে-তে জাপানি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি রিস্সো কোসেই-কাইয়ের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার সদস্যদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও বক্তব্য প্রদানের পাশাপাশি, তিনি সংস্থার আয়োজিত "আন্তর্জাতিক পুণ্ডরীক সূত্র সেমিনার" পরিচালনা, সংস্থার বই ও নথিপত্র অনুবাদ, এবং জাপানে বসবাসরত বিদেশিদের জন্য "আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্থা"-তে সহযোগিতাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

অন্যের সঙ্গে সংঘাত ও বিবাদ সৃষ্টি করে। মানবলোক: যেখানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয়, তবে একই সঙ্গে করুণাময় হৃদয়ও বিকশিত হতে পারে। আর স্বর্গলোক: যেখানে সাময়িক আনন্দ ও শান্তির ভোগ আছে, যদিও তা স্থায়ী নয়, একসময় তা বিলীন হয়ে দুঃখে পরিণত হয়। বৌদ্ধধর্ম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, এই ছয়টি গতি বা অস্তিত্বের স্তর—সবই মূলত দুঃখের জগৎ। এমনকি দেবলোকও অনন্ত সুখের স্থান নয়; সেখানকার আনন্দ একসময়ে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আবার ভোগান্তি এসে উপস্থিত হয়।

তবে, ষড়গতির আরেকটি গভীর ও ব্যবহারিক তাৎপর্য আছে। তা হলো—আমাদের এই সংসারজীবনের প্রতিটি মুহূর্তিক অস্তিত্বের ধরণ হিসেবেও ষড়গতিকে দেখা যায়। আমাদের মন অস্থির; বাইরের সামান্য পরিবর্তনেই তা দুলে ওঠে। এই কারণে আমরা বারবার ষড়গতির মানসিক

অবস্থার মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করি, নানান রূপে ছটফট করি। কখনো আমরা নরকের মতো ক্রোধ ও ঘৃণায় দগ্ধ হই, আবার কখনো স্বর্গের মতো ক্ষণস্থায়ী অথচ মায়াময় আনন্দে ডুবে যাই। এভাবে আমরা ছয়টি জগতের নানা মানসিক অবস্থার মধ্যে অবিরাম ঘুরে বেড়াই এবং দুঃখভোগ করি। উদাহরণস্বরূপ—যখন আমরা ক্রোধে গ্রাসিত হই, তখন আমাদের মন নরকে বন্দি হয়ে পড়ে। চারপাশের মানুষজন যেন সবাই আমাদের আঘাত করতে চাইছে বলে মনে হয়। কিন্তু, মন নরকে বন্দি থাকলেও সেই ক্রোধ কেবল অন্তরে থেমে থাকে না। কারণ, মন ও কর্ম একসূত্রে গাঁথা—মনের রূপ অনিবার্যভাবে কর্মে প্রকাশিত হয়। এইজন্য ক্রোধপূর্ণ মন থেকে উৎপন্ন আচরণ অন্যকে আঘাত করে, জিনিসকে নষ্ট করে, এবং অবশেষে সেই আঘাতের ফলস্বরূপ আমরা নিজেরাই কষ্টভোগ করি। বৌদ্ধধর্ম আমাদের এ বিষয়েই শিক্ষা দেয়। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের "উপমা অধ্যায়"-এ ব্যবহৃত "জ্বলন্ত অগ্নিগৃহের" উপমা এই সত্যকে গভীরভাবে তুলে ধরে। ষড়গতির এই দহনশীল মনের অবস্থা থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সত্যিকারের সুখ বা তৃপ্তি লাভ করতে পারি না। তাই, আমাদের অবশ্যই জ্বলন্ত অগ্নিগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং প্রবেশ করতে হবে সত্যিকারের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অবস্থায়, তথা নৈর্বাণিক শান্তিতে।

আমাদের সাধনার প্রথম লক্ষ্য হলো ষড়গতির "জ্বলন্ত অগ্নিগৃহ" তথা মানসিক অবস্থায় বন্দি মন থেকে মুক্তি পাওয়া। সৌভাগ্যবশত, পুণ্ডরীক সূত্র আমাদেরকে এই মানসিক বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার একটি নিশ্চিত পথ দেখিয়েছে—বিশেষত এগুলো হলো সেই তিনটি শক্তিশালী মনের অবস্থা যা আমাদের সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়: লোভ, ক্রোধ ও অজ্ঞতা। পুণ্ডরীক সূত্রের দ্বাদশ অধ্যায়, "দেবদত্ত অধ্যায়", যা প্রতিদিন রিস্সো কোসেই-কাই এর সদস্যরা আবৃত্তি করেন, সেখানে বলা হয়েছে—যিনি এই অধ্যায়ের শিক্ষা শোনেন, বিশ্বাস করেন এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তিনি লোভ, ক্রোধ ও অজ্ঞতার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। অন্তত, আমরা মানবিক বা স্বর্গীয় মানসিক অবস্থায় স্থিত থাকতে পারি, এমনকি যথাযথ সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব অর্জন করাও সম্ভব।

দেবদত্ত অধ্যায়ের মূল বার্তা কী? প্রতিষ্ঠাতা নিওয়ানো কাইসো বলেন—প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়ার সময় রাগ বা ঘৃণায় প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত নয়। বরং, সেই পরিস্থিতিকে নিজের বিকাশের সুযোগ এবং আরও উন্নত পৃথিবী গঠনের প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা উচিত, এবং যারা আমাদের কষ্ট দেয় তাদেরকে জীবনের শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এর অর্থ, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতার মনোভাব গড়ে তোলা। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাগ ও ঘৃণা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং আমাদের কষ্টও বৃদ্ধি পায়। রাগ বা ঘৃণার মাধ্যমে কিছুই অর্জিত হয় না; যেকোনো পরিস্থিতিতেই এটি বিষয়টিকে আরো ঘোলাটে করে। কিন্তু, কৃতজ্ঞতার মনোভাব গড়ে তোলার মাধ্যমে, আমরা প্রতিকূলতার নেতিবাচক শক্তিকেও ইতিবাচক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি, এবং এর ফলে, আমাদের মন লোভ, ক্রোধ ও

Tibetan Buddhist painting of the Six Realms of Existence

অজ্ঞতার দুঃখ থেকে মুক্তি পায়।

তবে, অনেকের কাছে প্রতিকূলতার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা অযৌক্তিক বা অবাস্তব পরামর্শের মতো মনে হতে পারে। তাহলে কেন আমাদের কষ্টের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত? এটি অনেকটা প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ডাম্বেলের ওজনের মতো। যদি ডাম্বেল খুব হালকা হয়, তা দিয়ে মাংসপেশি শক্তিশালী করা বা স্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্ভব নয়—এটি সবাই স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারে। আপনি যদি নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকান—আপনার বড় সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রতিকূলতা ও অসুবিধা। সেগুলোকে গ্রহণ করার কারণে আপনি সেই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। যেমনটি পুণ্ডরীক সূত্র আমাদের শিক্ষা দেয়—আমাদের জীবনে যে সবকিছু ঘটে, তা আমাদের সচেতনতা ও উপলব্ধি বৃদ্ধি করার জন্য আসে।

যখন আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে জীবনের কষ্টের মুখোমুখি দাঁড়াই, তখন আমরা সবচেয়ে বড় কষ্ট থেকে মুক্তি পাই। কেবল তাই নয়, আমাদের মন "বুদ্ধের সমীপে জন্মগ্রহণ" করতে সক্ষম হয়। এর দ্বারা বোঝায়—বুদ্ধ সর্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, এবং আমরা কখনোই একা নই।

সংঘের কার্যক্ষেত্রের প্রতিবেদন

হিদেমিৎসু সুজুকি, আন্তর্জাতিক মিশন উপ-পরিচালক

কয়েক বছর আগের কথা। আমার পরিচিত একজন মানুষ ছিলেন, যাকে আমি শুভেচ্ছা জানানোর পরও কোনো উত্তর দিতেন না। শুধু উত্তর না দেওয়াই নয়, বরং তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেন, যেন রাগ করে আছে। ধীরে ধীরে আমার ভেতরে বিরক্তি জমতে শুরু করল, আর মনে হলো— "যতই শুভেচ্ছা জানাই, কোনো মানে নেই; এতে শুধু আমিই অস্বস্তি পাই, তাই এ কাজ বন্ধ করাই ভাল।"

কিন্তু তারপরও আমি শুভেচ্ছা জানানো চালিয়ে যেতে থাকলে, মাঝেমধ্যে খুবই ক্ষীণস্বরে উত্তর পাওয়া যেত, যা খুব একটা কর্ণগোচর হতো না। আর উত্তর পাওয়া গেলে সত্যিই ভালো লাগত। কয়েকবার এভাবে ঘটতে থাকলে, উত্তর পেলে ভাবতাম— "হয়তো আজ তার কিছু ভালো ঘটেছে।" আর উত্তর না পেলে ভাবতাম— "সম্ভবত আজ সে কোনো কষ্টে আছে।" এইভাবে আমি ধীরে ধীরে তার অনুভূতির দিকেও মনোযোগী হতে লাগলাম। আগে যে আমার ভেতর কেবল রাগান্বিত মনোভাব উৎপন্ন হতো, তার তুলনায় এটি ছিল এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

এখন ফিরে তাকালে মনে হয়, তখন যখন আমি তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম এবং শুভেচ্ছা জানানোকে অর্থহীন মনে করেছিলাম— আমি হয়তো "নরক"-এ অবস্থান করছিলাম। যখন উত্তর প্রত্যাশা করছিলাম, সেটি ছিল আমার স্বার্থপর "অসুরের হৃদয়"। আবার যখন উত্তর পেয়ে আমি খুশি হই, তা ছিল 'স্বর্গীয়' অনুভব। আর যখন আমি তার মনের অবস্থার কল্পনা করতে শুরু করেছিলাম, এটাই হয়ত 'মানবিক' মনোবৃত্তি ছিল। এভাবে ভেবে দেখলে বুঝতে পারি— দৈনন্দিন জীবনে আমরা কতো সহজেই ষড়্গতি সংসারে ঘুরপাক খাই। কিন্তু যখন তার ভেতরে থাকি, তখন সেই সত্যকে অনুধাবন করতে পারি না। এই কারণেই নিজের অবস্থা অনুভব করাতে সাহায্য করে এমন মানুষগুলো সত্যিই মূল্যবান।

"অন্যের কারণে আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। অন্যের কারণে আমার বেড়ে ওঠার সুযোগ মিলেছে" — এই সত্য ভুলে না গিয়ে, আমি প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় অবিরত সাধনায় অগ্রসর হতে চাই।

বুদ্ধের কৃপা ও দয়ার প্রতিদান

যেভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে সেভাবে বাঁচা

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্সো কোসেই-কাই।

যেহেতু আমরা সর্বদা বুদ্ধের অবারিত সুরক্ষায় আচ্ছন্ন, তাই হৃদয়ে এই মনোভাব জাগ্রত রাখা প্রয়োজন— "আমি যেন আমার সাধ্য অনুযায়ী বুদ্ধের করুণার প্রতিদান দিতে পারি।" কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই অশেষ করুণার প্রতিদান আমরা কীভাবে দিতে পারি?

আমরা যে বুদ্ধের শরণে আশ্রয় গ্রহণ করি, তাঁকে সম্বোধন করা হয়— "শাশ্বত বিরাজমান মহান হিতৈষী শাক্যমুনি বুদ্ধ"। "তথাগতের শাশ্বত জীবন অধ্যায়" এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যিনি অনন্তকাল পূর্ব থেকে বিরাজমান মূল বুদ্ধ, এবং যিনি এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন শাক্যমুনি বুদ্ধ রূপে— মূলত একই সত্তা। তবে বুদ্ধের মহান কৃপা-অনুগ্রহের প্রতিদান নিয়ে চিন্তা করতে গেলে, উপযুক্ত হবে তাঁদের দুই দিককে আলাদাভাবে দেখা— একদিকে কল্পকালের বিরাজমান শাশ্বত বুদ্ধ, আর অন্যদিকে সেই শাক্যমুনি বুদ্ধ যিনি ধর্মদেশনা করেছেন।

প্রথমে যা স্মরণ রাখা প্রয়োজন তা হলো— আমরা বেঁচে আছি কারণ আমাদের ধারণ করেছেন সেই "শাশ্বত বুদ্ধ", যাকে বলা যায় "মহাবিশ্বের মহাজীবন"। তাই আমাদের বাঁচার আদর্শ হওয়া উচিত— "যেমনভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তেমনভাবেই জীবন যাপন করা।" এই জীবনে প্রত্যেকেরই একটি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সেই দায়িত্ব সচেতনভাবে পালন করে, কর্তব্যের পথে

চলতে চলতেই আমাদের আত্মশুদ্ধি সাধন করতে হয়। বৌদ্ধধর্মে একে বলা হয় “ধর্মানুশীলনের প্রচেষ্টা”, আর এই প্রচেষ্টাই বুদ্ধের করুণার প্রতিদান দেওয়ার প্রথম ধাপ।

পরবর্তীতে বুঝতে হবে— শাশ্বত বুদ্ধ কেবল মানুষকে নয়, বরং সমস্ত জীবজন্তু থেকে শুরু করে উদ্ভিদ ও এমনকি বায়ু, জল, মাটি প্রভৃতি জড় পদার্থকেও সমভাবে ধারণ করছেন। এই সত্য যখন অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করে, তখন অন্তর থেকে অনুভূত হয়— “আমি নিজের চেষ্টায় বেঁচে নেই; আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন শাশ্বত বুদ্ধ, এবং প্রকৃতপক্ষে আমি টিকে আছি সমস্ত মানুষ, সমস্ত জীবজন্তু ও সমগ্র জগতের সমর্থনে।”

এবং তখনই স্পষ্ট হয় যে— শাশ্বত বুদ্ধের কৃপা-অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে হলে আমাদের সকল মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ, এমনকি বায়ু, জল ও ধরিত্রী পর্যন্ত— যাদের দ্বারা আমরাও বাঁচি— তাদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের মমতা, সহানুভূতি ও দয়ার আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। এই মহৎ কার্যকলাপকেই বলা হয় “দান”।

অতএব, ধর্মানুশীলন এবং দান এই দুইয়ের বাস্তব সাধনাই হলো বুদ্ধের অনন্ত কৃপা-অনুগ্রহের প্রকৃত প্রতিদান।

নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১ 『বোধিবীজকে জাগ্রত করা』 পৃষ্ঠা ৮৪-৮৬।

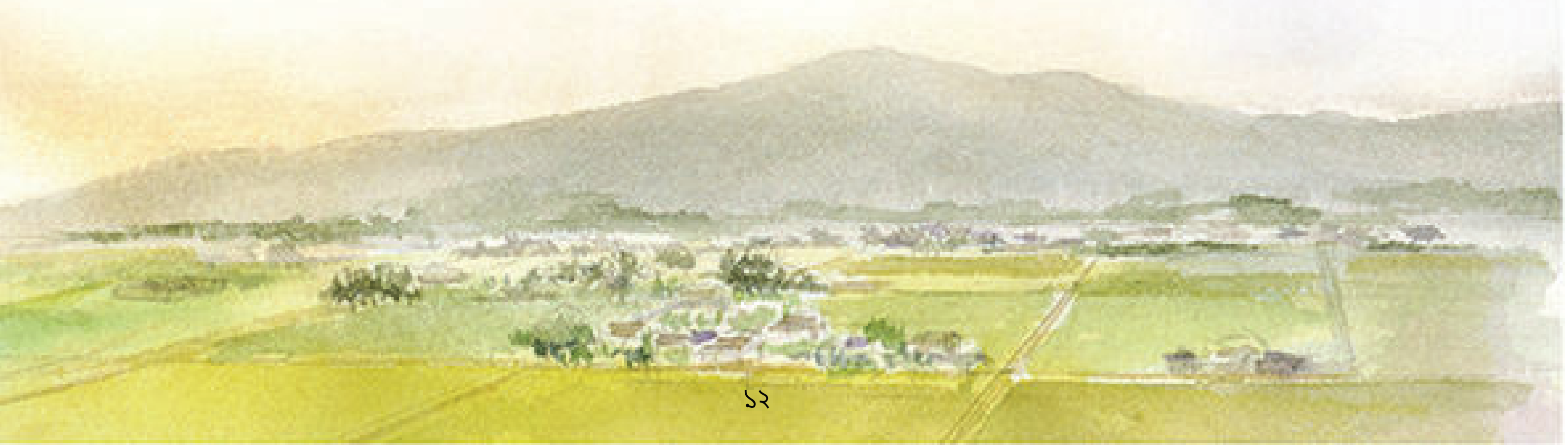

Director’s Column

শরতের দীর্ঘ রাতে জ্ঞানের সাধনা

Rev. Keiichi Akagawa
Director, Rissho Kosei-kai International

সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। শরৎকালীন পূর্বপুরুষ স্মরণ দিবস (ওহিগান) ইতোমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে, তবুও জাপান জুড়ে এখনো গ্রীষ্মের উষ্ণতার আবেশ যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আশা করি আপনারা সকলেই সুস্থ ও ভালো আছেন।

প্রতি বছর শরৎ ঘনিয়ে এলে আমরা প্রায়শই শুনি— “শরৎ হলো পাঠের ঋতু”, “দীর্ঘ শরতের রাত্রি” কিংবা “পাঠ সপ্তাহ” ইত্যাদি কথা। এ মাসের ধর্মোপদেশে, আমাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মহোদয় শরৎ গভীর হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ‘মনোজমিনের চাষ’ করার এক বিশেষ উপায় হিসেবে পাঠাভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নিজে একান্ত অনুরাগী পাঠক হিসেবে তিনি পাঠের সুফল নিয়ে তার স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর বাণী আমাদের উপহার দিয়েছেন।

তবে, প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আপনাদের রুচি কোন দিকে? আপনারা কি কাগজের বই হাতে নিয়ে পড়তে ভালোবাসেন, নাকি আধুনিক ই-বুক আকারে পর্দায় পড়া আপনাদের বেশি আনন্দ দেয়? সাম্প্রতিক সময়ে কাগজের বইয়ের পাশাপাশি ক্রমেই ই-বুক পাঠকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এ প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, আমাদের ৫২ বছরের গৌরবময় ইতিহাস বহনকারী ইংরেজি প্রকাশনা “ধর্মা ওয়ার্ল্ড”-ও এ শরৎ সংখ্যা থেকে মুদ্রিত সংস্করণকে বিদায় জানিয়ে ডিজিটাল রূপে পাঠকদের কাছে পৌঁছাবে। এই সুযোগে আপনাদের এ পরিবর্তনের সংবাদ জানাচ্ছি এবং আগের মতোই আপনাদের আন্তরিক পাঠ-সমর্থন কামনা করছি।

আসলে, যে কোনো আঙ্গিকেই হোক না কেন, পাঠ এমন এক অভ্যাস যা মনকে সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত করে। ব্যস্ত জীবনের স্রোতে ভেসে গিয়ে যেন আমরা কেবল অগভীর ও নিরস শব্দে সীমাবদ্ধ না হই। এ মাসের ধর্মোপদেশকে উপলক্ষ করে আমি চাই, দীর্ঘ শরতের রাত্রিগুলোতে ধীরে ধীরে উপভোগ করতে— সেই অসীম করুণা ও প্রজ্ঞার জগৎ, যা সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রিয় পাঠক, আপনিও কি আমার সঙ্গে এই পথে এগিয়ে চলতে ইচ্ছুক নন?

বামপাশে: ৬ সেপ্টেম্বর কোরিয়া শাখায় অনুষ্ঠিত ওবোন অনুষ্ঠানের আগে সদস্যদের লণ্ঠন এবং পুষ্প পূজার দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন পরিচালক আকাগাওয়া। ডানপাশে: অনুষ্ঠানের পরে আয়োজিত হোজায় সভাপতিত্ব করছেন পরিচালক আকাগাওয়া (মাঝখানে)।

A Global Buddhist Movement

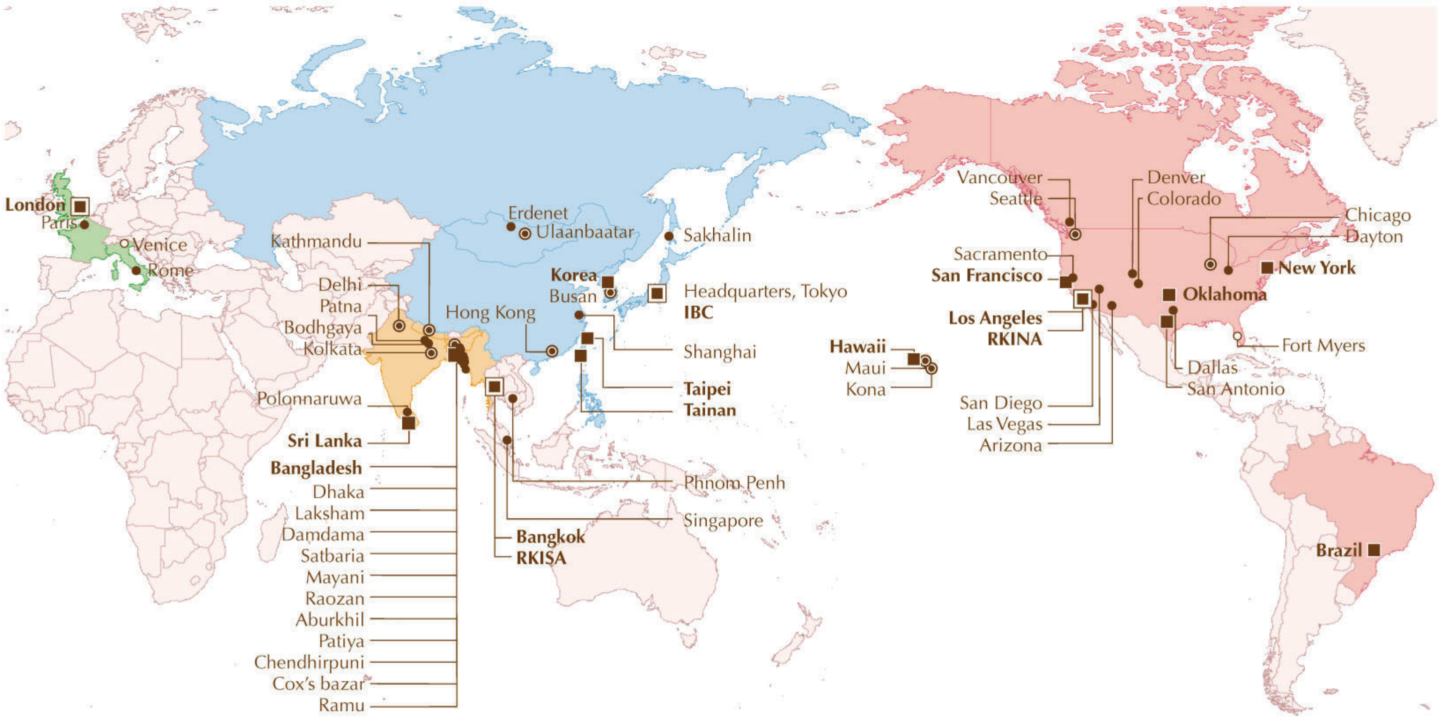

Information about local Dharma centers

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp